১৫

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার

নাঈম মোহাইমেন

এ অধ্যায়ে থাকছে অর্পিত সম্পত্তি আইন-এর ধারাবাহিক প্রয়োগ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং এই আইন রদ করবার আন্দোলন। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যালঘু ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনা এবং তাদের সম্পত্তি দখল যা প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকেন্দ্রিক। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে অধ্যায়ের উপসংহারে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে বিতর্ক সাধারণত বিচ্ছিন্নভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনাগুলোতে কেন্দ্রীভূত। যারা বলতে চান বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জীবনে কোনো প্রতিকূলতা নেই, তারা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন– এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নেই এবং জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের রয়েছে উজ্জ্বল উপস্থিতি, যা ব্যাপক ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে প্রমাণ করে। এই আলোচনায় বাদ পড়ে যায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যতিক্রম হলো, ১৯৬৫ থেকে ২০০৭[১] সাল পর্যন্ত হিন্দু সম্পত্তির ওপর অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাব বিষয়ে ২০০৮-এ একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ।

১ আবুল বারাকাত, শফিক উজ জামান, মোঃ শাহনেওয়াজ খান, অভিজিত পোদ্দার, সাইফুল হক এবং এম. তাহের উদ্দিন, ডিপ্রাইভেশন অব হিন্দু মাইনরিটি অব বাংলাদেশ: লিভিং উইথ ভেসটেড প্রপারটি, ২০০৮, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ।

অর্পিত সম্পত্তি আইনের রূপান্তরের ইতিহাস

অর্পিত সম্পত্তি আইনের অপব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র দ্বারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ভূমি দখল ও তাদের উচ্ছেদ দেশ বিভাগের পর থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত চলছে। ১৯৪৭-৪৮-এ ২০ লাখ হিন্দুর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ত্যাগের পরে 'সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন' (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) পাস করা হয়, যা রাষ্ট্রকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি 'রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ'-এর ক্ষমতা দেয়। এই আইন আরো কার্যকরভাবে রূপান্তরিত হয় 'পূর্ব বাংলা আইন' (১৯৫১) হিসেবে, পরবর্তীকালে যথাক্রমে 'পূর্ব পাকিস্তান উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অধ্যাদেশ' (১৯৬৪), 'শত্রু সম্পত্তি আইন' (১৯৬৫), 'বাংলাদেশ অর্পিত সম্পত্তি আইন' (১৯৭২) এবং সর্বশেষ 'অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইন' (১৯৭৪) হিসেবে। এর সবক'টি আইনই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্র দ্বারা 'সম্পত্তির অধিকার' লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' পাস করে। যদিও এটাই প্রথম মাইলফলক, কিন্তু সেখানেও বেশ কিছু বড় ত্রুটি ছিল, যেগুলো হলো : এই আইন কেবল ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মালিক অথবা মালিকের উত্তরাধিকারীকে 'নিরবচ্ছিন্ন'ভাবে বাংলাদেশে বাসরত থাকতে হবে এবং ফেরতযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে মালিককে দরখাস্ত করতে হবে।

২০০২ সালের নভেম্বর মাসে চারদলীয় জোট সরকার '২০০১ আইন'-এর সংশোধনী আনে যা এই আইনের কার্যকারিতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে। বিশেষ করে এই সংশোধনী সরকারকে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ ও সম্পত্তি ফেরতদানে 'অনির্দিষ্ট সময়' নেয়ার ক্ষমতা দেয়। এজন্য গত ছয় বছরে একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়নি বা কোনো সম্পত্তি ফেরত দেয়া হয়নি।

দুর্গাপূজা

বক্স ১৫.১ : ফলাফলের পরিমাণ নির্ণয়

অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলাফল পরিমাণ নির্ধারণে অধ্যাপক বারকাত উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিবিধ উপায় ব্যবহার করেছেন:

১. **জনসংখ্যা :** ১৯৬১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ ছিল হিন্দু যা ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯ ভাগে। ২০০১ সালে মোট হিন্দু এক কোটি ১৪ লাখ যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দুই কোটি ২৮ লাখ হওয়ার কথা। চাঁদপুর, ফেনী, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, পাবনা এবং নারায়ণগঞ্জ– এই ছয়টি জেলায় এই হ্রাসের পরিমাণ সর্বাধিক।

২. **পরিবারের সংখ্যা :** বার লক্ষ হিন্দু পরিবারের শতকরা ৪৩ ভাগ শত্রু সম্পত্তি আইন অথবা অর্পিত সম্পত্তি আইন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। ভূমি হারানো পরিবারগুলোর শতকরা ৫৭ ভাগ গড়ে ১০০ শতাংশ ভূমি হারিয়েছে।

৩. **মোট হারানো ভূমি :** হিন্দু সম্প্রদায় মোট ভূমি হারিয়েছে বাংলাদেশের মোট ভূমির শতকরা ৫.৫ ভাগ, দুই কোটি এক লক্ষ একর, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মোট ভূমির শতকরা ৪৫ ভাগ। সরকারি হিসাবের চেয়ে শতকরা ২২ ভাগ বেশি ভূমি হারানোর উপাত্ত জরিপে উঠে এসেছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট হারানো ভূমি দুই কোটি ৬০ লক্ষ একর। হারানো ভূমির ধরন প্রধানত কৃষিভূমি (শতকরা ৮৪ ভাগ), এরপরে বসতভিটা (শতকার ১১ ভাগ), পুকুর বা জলাশয় (শতকরা ১.২ ভাগ), বাগান (শতকরা ১.৭ ভাগ), পোড়োজমি (শতকরা ০.৭ ভাগ), বাণিজ্যিক ভূমি (শতকরা ০.১৪ ভাগ), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমি (শতকরা ০.০২ ভাগ) এবং অন্যান্য (শতকরা ৩.২ ভাগ)।

৪. **মূল্যমান :** ২০০৭ সালের গড় বাজারদর অনুযায়ী হারানো জমির মোট মূল্য আনুমানিক দুই লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৭.৩ কোটি টাকা। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের হিসাবে এই মূল্য তিন লক্ষ দশ হাজার ৬৬৩.৬ কোটি টাকা। এমনকি হিন্দুদের জমি অত্যন্ত কম দামে বিক্রি হয়েছে; হিন্দুদের জমির একর প্রতি গড় দাম দুই লক্ষ টাকা, যেখানে মুসলিম মালিকানাধীন জমির গড় দাম একরপ্রতি ১৫ লক্ষ টাকা।

৫. **সময়সীমা :** মোট হারানো ভূমির শতকরা ৭৪ ভাগ এবং ভূমি হারানোর শতকরা ৫৩ ভাগ ঘটনা ঘটেছে ১৯৬৫-১৯৭১ সময়সীমার মধ্যে। ১৯৭২-১৯৭৫ -এ সময়সীমার নিম্মমাত্রায় হারানোর পরে ১৯৭৫ সাল থেকে হারানোর মাত্রা আবার বেড়ে যায়। এমনকি ২০০১ সালে 'রদ আইন' পাস হওয়ার পরে ২০০১-০৬ এই পাঁচ বছরে মোট ভূমি হারানোর শতকরা আট ভাগ ঘটনা ঘটেছে।

৬. **জবরদখলের পদ্ধতি :** প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তহসিল ও থানা রাজস্ব অফিসের যোগসাজশে, তহসিল ও থানা রাজস্ব অফিস নিজেরাই, হিন্দু পরিবারের একজনের বহির্গমন অথবা মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পুরো জমিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে দেখানো, স্থানীয় মাস্তান ও সহিংস ঘটনা সহযোগে বল প্রয়োগে, জাল দলিল ব্যবহার ইত্যাদি উপায়ে ভূমি জবরদখল করেছে।

৭. **সংশ্লিষ্ট হয়রানি ও বিড়ম্বনা :** ভূমি দখলের সাধারণ উপায় হিন্দু পরিবারের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন (শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে), ২০০১ সালের নির্বাচনে ভোটদানে বাধা দেয়া হয়েছে (শতকরা ২৭ ভাগ), ফসল তুলতে বাধা (শতকরা ২৫ ভাগ), কর্মক্ষেত্রকে অসহনীয় করে তোলা (শতকরা ২০ ভাগ), সম্পত্তির ধ্বংসযজ্ঞ (শতকরা ১৪ ভাগ), রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্তকরণ (শতকরা ১৩ ভাগ), লুটপাট (শতকরা দশ ভাগ), চুরি-ডাকাতি (শতকরা ছয় ভাগ), দোকানপাট ভাঙচুর (শতকরা পাঁচ ভাগ), চাঁদাবাজি (শতকরা পাঁচ ভাগ)।

২০০৮-এ গৃহীত নতুন আইনি পদক্ষেপ

ভূমি দখলের বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে সরকার একটি নতুন আইন ‘ভেসটেড প্রপারটি অ্যাক্সামিনেশন অ্যান্ড রেজুলেশন অ্যামেন্টমেন্ট বিল’-এর খসড়া তৈরি করে। আইনটি জনসমক্ষে প্রকাশিত হলে সুশীল সমাজ, মানবাধিকার সংগঠন যারা ভূমিহীন মানুষজনের অধিকার নিয়ে কাজ করে তারা এই আইনে ব্যাপক ত্রুটি আছে বলে আপত্তি তোলেন এবং প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার আইনটি মুলতবি করে।[২]

অক্টোবর ২০০৮-এ আইন ও ভূমি উপদেষ্টা হাসান আরিফ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন ট্রাইব্যুনাল এবং একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ঘোষণা দেন। উপদেষ্টা সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকার প্রয়োজনে ‘প্রশাসনিক জটিলতা’[৩] নিরসনে ২০০১ সালের আইন পুনঃসংশোধন করবে। কিন্তু এরকম জটিল একটি বিষয়ে সঠিক ও পর্যাপ্ত পরামর্শ ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন জরুরি হয়ে পড়ল, কিংবা কোন্ আইনি এখতিয়ারে ও নীতিগত উপায়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলো– তা পরিষ্কার করা হয়নি। সংবাদমাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র অধিকতর সমস্যাজনক ২০০২-এর সংশোধনী[৪] প্রসঙ্গে কিছুই না বলে ২০০১-এর অর্পিত সম্পত্তি রদ আইনের বিধানগুলোর ইতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করেন।

---

২ ২০০৮-এর জুলাই মাসে সংশোধনীর অস্পষ্টতাগুলো ব্যাখ্যা করে একটি নথি প্রধান উপদেষ্টার দফতরে জমা দেয়া হয়: ক) ‘অর্পিত সম্পত্তি’ বলতে কোন ধরনের ভূমি বোঝানো হয়েছে– অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে যা সরকারের কাছে রয়েছে, অর্পিত সম্পত্তির সরকারি তালিকায় যেগুলো দেখানো হয়েছে অথবা এই সংশোধনী উত্তর উপজেলা কমিটি সেগুলোকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করবে সেগুলো; খ) স্থানীয় ভূমি/তহসিল অফিসকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অর্পিত সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও মালিকানা নির্ধারণের। অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক অধিকাংশ ঘটনায় উপজেলা ও অন্যান্য ভূমি অফিস সরাসরি যুক্ত ছিল। যার ফলে অপরাধীকেই দায়িত্ব দেয়া হয় তার অপরাধের তদন্ত করার। এর বিপক্ষে একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী (সর্বোচ্চ আদালতের সাবেক বিচারক), অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল (আইন ও সালিশ কেন্দ্র), ড. কাজী খলীকুজ্জমান (বাংলাদেশ অর্থনীতিবিদ সমিতি), লে. জেনারেল (অব.) হারুন-উর-রশিদ (সাবেক সেনাপ্রধান), কামাল লোহানী (চেয়ারম্যান, অর্পিত/শত্রু সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন), তসলিমুর রহমান (ব্লাস্ট), খুশী কবির (নিজেরা করি), সামসুল হুদা (ভূমি সংস্কার ও উন্নয়ন সমিতি), অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী (সদস্য, অর্পিত/শত্রু সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন), ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা (রিইব), ব্যারিস্টার সারা হোসেন, প্রফেসর আবুল বারাকাত প্রমুখ।

৩ কাজী আবদুল হান্নান, ‘অর্পিত সম্পত্তি বাংলাদেশি মালিকদের কাছে ফেরত দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে’, *সমকাল*, ২৩ অক্টোবর ২০০৮।

৪ *সমকাল*, ২৩ অক্টোবর ২০০৮।

কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকা এবং অর্পিত সম্পত্তির মামলায় কেবল আইনি সমাধানকেই পর্যাপ্ত বিবেচনা করায় প্রকৃত দাবিদার ব্যক্তিদের ভূমি উদ্ধারে অকল্পনীয় কষ্ট ও আইনি দীর্ঘসূত্রতার মুখোমুখি হতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া ভুক্তভোগী পরিবারকেই কেবল ভোগায়, বিপরীতে দখলদাররা সরকারি ভূমি বিভাগের সহায়তায় ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আনুকূল্যে দশকের পর দশক ভোগদখল অক্ষুণ্ন রেখেছে। চরম দীর্ঘসূত্রতার উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে, দুই দশকব্যাপী *মিহির চন্দ্র ভৌমিক বনাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিসি* মামলায় ২০ শতাংশ জমি নিয়ে আইনি লড়াই।[৫]

জয়ন্ত কুমার রায়ের মামলাটি স্থানীয় ভূমি বিভাগের বিপজ্জনক ভূমিকা ও বহুবিধ ঐতিহাসিক পরিহাস উন্মোচন করে। ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে রায়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু মরণোত্তর 'মুক্তিযোদ্ধা'র সনদ পাওয়ার পরিবর্তে তার পরিবার দেখতে পায় তাদের জমি স্থানীয় এজেন্টরা 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে বাজেয়াপ্ত করেছে। দশকের পর দশক ধরে চেষ্টা চালানোর পরে তার ভাইপো অঞ্জন রায় শেষ পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে থেকে এই জমি 'অর্পিত সম্পত্তি' নয়– এই মর্মে একটি নোটিশ পায়। এই নোটিশ সত্ত্বেও পাবনা জেলা প্রশাসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় জমির দখলদার জমিতে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ অব্যাহত রাখে।[৬]

২০০৮-এর সংঘটিত কিছু ঘটনা

বিগত বছরগুলোর মতোই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানির ঘটনা সাধারণভাবে ঘটে, যা দেশের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতিকে ক্ষুণ্ন করার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখে। যারা নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি অস্বীকার করতে চান, তারা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন নির্যাতন, লুটপাট, ধর্ষণের মতো ঘটনা যা দেশের সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে ঘটে থাকে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, অক্টোবর ২০০৮-এ ১৬ বছরের শিক্ষার্থী পূর্ণিমা মহন্তকে তার বাড়ি থেকে হামলাকারীরা অপহরণ করে।[৭] তাছাড়া

---

৫ মিহির চন্দ্র ভৌমিক বনাম ডিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং অন্যান্য (বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী-জে.), ১৩ এমএলআর (এইচসিডি) ২০০৮।

৬ প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে অঞ্জন রায়ের দ্বিতীয় আবেদন, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮।

৭ *আজ ও আগামীকাল*, ২৮ অক্টোবর ২০০৮।

খবর প্রকাশিত হয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চল্লিশ সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর আক্রমণের,[৮] আরও খবর আসে পুরোহিত অনুরানী বিশ্বাস হত্যার।[৯] ডা. বিমল শীলের দায়ের করা লোমহর্ষক বাঁশখালী হত্যা মামলা (২০০৩-এ এক হিন্দু পরিবারের এগারো সদস্যকে পুড়িয়ে মারা হয়) আইনি ব্যবস্থা অসহযোগিতা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। এই অসহযোগিতার পেছনে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর ভাই আমিনুর রহমান চৌধুরী জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।[১০] ২০০৮ সালে এই মামলার অগ্রগতি হিসেবে দেখা যায়, জুলাইয়ে কালিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুরকে এই মামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।[১১]

এ বছর মন্দির ছিল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু; মন্দির আক্রমণের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে আশ্রমে হামলা চালানো হয়, সেইসাথে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ করা হয় এবং বয়স্ক পুরোহিত অবিনাশ চন্দ্র গোঁসাইকে খুন করা হয়।[১২] গৌরনদীতে দুইশ' বছর পুরনো মন্দিরের প্রতিমা ধ্বংসের ঘটনা,[১৩] রংপুরের বদরগঞ্জে মন্দিরে আগুন দেয়ার ঘটনা[১৪] এবং বরিশালের আগৈলঝড়ায় প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটে।[১৫] শেষ ঘটনাটির ক্ষেত্রে দেখা যায় একই উপজেলার কালুপাড়া গ্রামের অজয় দাশগুপ্তের বাড়িতে লুটপাটের ঘটনার চারদিন আগে সেখানে হামলা চালানো হয় এবং বাড়িতে রাখা প্রতিমাগুলোও ধ্বংস করা হয়। এসব আক্রমণের উদ্দেশ্য লুটপাট বা সাম্প্রদায়িক আক্রমণ কিংবা দুটোই। তা যাই হোক না কেন একটি ঘটনা ঘটার পর তার শাস্তি না হওয়ায় একই জায়গায় পরবর্তী আক্রমণের পরিবেশ তৈরি হয়। আরো উদ্বেগজনক বিষয় হলো প্রশাসনের সহযোগিতায় যখন এসব ঘটনা ঘটে; যেমনটা ঘটেছে বাগেরহাটে, যেখানে মন্দির প্রাঙ্গণে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ

---

৮ 'বি'বাড়িয়ায় ৪০ সংখ্যালঘু পরিবার সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে', *জনকণ্ঠ*, ১৯ এপ্রিল ২০০৮।

৯ 'পাইকগাছায় মন্দিরের সাধক খুন', খুলনা ব্যুরো, *যুগান্তর*, ৬ জানুয়ারি ২০০৮।

১০ 'তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর নারাজির শুনানি ১৯ মার্চ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ মার্চ ২০০৮; *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

১১ *'আমিন চেয়ারম্যান সেন্ট টু জেল'*, *নিউ এজ*, ৮ জুলাই ২০০৮।

১২ *সংবাদ*, ১৬ নভেম্বর ২০০৮।

১৩ 'গৌরনদীতে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর', *যুগান্তর*, ১৯ এপ্রিল ২০০৮।

১৪ 'বদরগঞ্জে মন্দিরে আগুন, মূর্তি ভাংচুর', *সংবাদ*, ২৬ এপ্রিল ২০০৮।

১৫ 'আগৈলঝড়ায় প্রকাশ্যে মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর' *সমকাল*, ২৭ আগস্ট ২০০৮।

নেয়া হয়। এর প্রতিবাদে শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা পৌরসভা কার্যালয়ে সমবেত হয় এবং কীর্তন, কবিগান ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণ অপরিবর্তিত রাখার দাবি জানায়।[১৬] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের বহু ঘটনায় দেখা গেছে স্থানীয় পুলিশ মামলা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল।

যেসব ক্ষেত্রে ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে সেসব ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা গেছে সংঘটিত সহিংসতার পেছনে জমি দখল প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে; যার মূলে রয়েছে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন'। ভূমি জবরদখলের প্রচেষ্টা সবসময়ই সহিংসতা সহযোগে ঘটে; যেমন ঈশ্বরগঞ্জে ভূমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে কামার অমল রায়ের পরিবার প্রতিবেশীদের আক্রমণে এক বছর যাবৎ গৃহে বন্দি থাকতে বাধ্য হয়।[১৭] রংপুরে স্থানীয় মাস্তানরা শাহা দেব রায়কে তার জমি বিক্রি করে ভারত যাওয়ার জন্য চাপ দেয়।[১৮] পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর মৃত্যুর পেছনেও প্রকাশিত হয় ভূমি বিরোধের জের। উলিপুরে উপেন্দ্রনাথ চন্দ্রের এক একর জমি আদালতের হুকুম অগ্রাহ্য করে জবরদখল করা হয়।[১৯]

এমনকি গণমাধ্যমের পরিচিতিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না; দৈনিক জনকণ্ঠের সাংবাদিক নিরঞ্জন পাল এবং বিখ্যাত কলাম লেখক ও অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল ও টেলিভিশন প্রযোজক অঞ্জন রায়ের পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা হয়েছে (উপরে দেখুন)।[২০] তাছাড়া শাহজাদপুর মন্দিরের ভূমি দখল খবর[২১] এবং নওগাঁর ঘাটকৈর গ্রামের উমারানী সরকারের উত্তরাধিকারীদের তিরিশ বিঘা জমি দখলেরও খবর প্রকাশিত হয়েছে।[২২] সংবাদপত্রে আরও খবর এসেছে যে, স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী নেতা নওগাঁর বদলগাছি উপজেলার কমরপুর গ্রামের আনন্দ কুমার শীলের জমি দখলের চেষ্টা করছিল।[২৩] এছাড়া বগুড়ার শাহজাহানপুর

১৬ 'বাগেরহাট পৌর কার্যালয় ঘেরাও করেছে এলাকাবাসী', *সংবাদ*, ১৮ মে ২০০৮।

১৭ 'ঈশ্বরগঞ্জে উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সংখ্যালঘু পরিবার', *জনকণ্ঠ*, ২৯ এপ্রিল ২০০৮।

১৮ 'রূপগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা', *জনকণ্ঠ*, ৭ আগস্ট ২০০৮; আরো দেখুন : *যুগান্তর*, ৭ আগস্ট ২০০৮; *সংবাদ*, ৭ আগস্ট ২০০৮।

১৯ 'উলিপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের এক একর জমি জবরদখল', *সংবাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

২০ 'মির্জাপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের ভূমি দখলের চেষ্টা', *জনকণ্ঠ*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

২১ 'শাহজাদপুর মন্দিরের জমি জবরদখল', *সংবাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

২২ 'নওগাঁয় সংখ্যালঘুর ৩০ বিঘা জমি দখলের পায়তারা', *জনকণ্ঠ*, ১৫ জুলাই ২০০৮।

২৩ 'নওগাঁয় জামায়াত নেতার মদদে সংখ্যালঘুর জমি দখলের চেষ্টা', *জনকণ্ঠ*, ২ আগস্ট ২০০৮।

উপজেলার জামায়াত নেতা আজাদুর রহমান স্বপন কুমার কুণ্ডুর জমির চারদিকের সীমানা চিহ্ন উপড়ে তা দখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[২৪]

হিন্দুদের ভূমির ওপর আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে অর্পিত সম্পত্তি আইনের পদচিহ্ন ব্যবহৃত হতে যেমন দেখা যায় তেমনি 'ভারত যাচ্ছে' প্রচারণাও এ ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

যদি কোনো সন্ত্রস্ত পরিবার ভারত (বা অন্য কোথাও) যায় তাহলে 'নিরবচ্ছিন্ন' বসবাসের শর্ত ভঙ্গ হয় এবং ঐ জমি দখল করা যেতে পারে (এমনকি অর্পিত সম্পত্তি রদ আইনেও এই ধারাটি বলবৎ আছে)। এভাবেই কালিয়াকৈরে পরিতোষ চন্দ্র সরকারসহ কতিপয় হিন্দু পরিবারের জমি জবরদখলের লক্ষ্যে স্থানীয় নেতা হজরত আলী শারীরিক আক্রমণের হুমকি দেয় এবং ঐ পরিবারগুলোকে 'ভারত গমনের' নির্দেশ দেয়।[২৫] কেরানীগঞ্জে দুইশ' বছর পুরনো পার্থনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষসহ জমি সংবাদপত্রের ভাষায় 'ভূমিদস্যুরা' অর্পিত সম্পত্তি আইন ব্যবহার করে দখল করে নেয়।[২৬]

দৈনিক *প্রথম আলোর* একটি তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রাণগোবিন্দ জমিদার পরিবারের তিন একর জলাশয় জেলা প্রশাসনের লোকদের সহায়তায় জাল দলিল তৈরি করে দখল করে নেয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা।[২৭] *ইত্তেফাকের* আরেকটি তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়– বিএনপি-জামায়াত সরকারের সাথে সম্পর্কিত এক রাজনীতিবিদের পরিবার যশোরে এগারো হাজার তিনশ' একরেরও বেশি জমি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে জবরদখল করে।[২৮] *যুগান্তর* রিপোর্ট অনুযায়ী চট্টগ্রাম ভূমি প্রশাসন তিরিশ হাজার একর জমি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে দখল নেয় (ব্যক্তিগত পর্যায়ের দখল এই হিসেবে দেখানো হয়নি), যার মাত্র ৫,০০০ একর সত্যিকারভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে, বাকিটার হদিস প্রশাসন জানে না।[২৯] যদিও সংবাদমাধ্যমে এসব ঘটনার প্রতিবেদন অনিয়মিতভাবেই আসে, তবু কদাচিৎ

---

২৪ 'বগুড়ায় জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ', *জনকণ্ঠ*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮, *সমকাল*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৫ 'দেশত্যাগের হুমকি', *সংবাদ*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৬ 'ঐতিহ্যবাহী পার্থনাথ মন্দির বেদখল হয়ে গেছে', *জনকণ্ঠ*, ১৪ আগস্ট, ২০০৮।

২৭ 'জাল কাগজ তৈরিতে প্রশাসনের লোকও জড়িত', *প্রথম আলো*, ২০০৮।

২৮ 'যশোরে বিপুল পরিমাণ অর্পিত সম্পত্তি প্রভাবশালীদের দখলে', *ইত্তেফাক*, ৯ মে ২০০৮।

২৯ '৩০ হাজার একর অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে প্রশাসন বিপাকে', *যুগান্তর*, ৯ জুন ২০০৮।

প্রকাশিত হওয়া এসব তদন্ত প্রতিবেদন এই প্রসঙ্গে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

আহমদিয়া সম্প্রদায়

কিছু চরমপন্থি ইসলামি গ্রুপের আক্রমণের মুখে আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উত্তেজনা ধারাবাহিকভাবে চলছে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় ছিল ২০০৩-০৪-এ, যখন তাদের উপাসনালয়গুলো পরিকল্পিত আক্রমণের শিকার হয় এবং বাংলাদেশ সরকার তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো নিষিদ্ধ করে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সুশীল সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং আইনি চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত সরকারের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেন। এই নজিরবিহীন রুলিংয়ের পরে যদিও খুলনার মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবার চরমপন্থি গ্রুপগুলোর আক্রমণের শিকার হয়েছে,[৩০] কিন্তু আহমদিয়া মসজিদগুলোতে কোনো আক্রমণ হয়নি। রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের নেতাদের উপস্থিতিতে আহমদিয়াদের উৎসবগুলো কোনোরকম অঘটন ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে।

যদিও কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি,[৩১] তবু উল্লেখ করা দরকার যে, 'আমরা ঢাকাবাসী' আয়োজিত সেমিনারে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে (বিপক্ষের ভাষায় কাদিয়ানি) অমুসলিম ঘোষণার দাবি করা হয়।[৩২] এই গ্রুপটি আগে রাস্তায় সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে, আর এখন ঘৃণাসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের দাবির পক্ষে আইনি যুক্তিমালা তুলে ধরছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ করার দাবিতে আদালতে আবেদনের প্রেক্ষিতে কেউ মনে করতে পারে যে, ভবিষ্যতে এসব গ্রুপ তাদের দাবির পক্ষে রাস্তায় বিক্ষোভ না করে আইনি পথে এগোবে এবং এটাকে তারা দায়িত্বশীলতার আপাত নমুনা হিসেবে ভাববে।

দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর এসব আক্রমণকে ধর্মীয় গোঁড়া সম্প্রদায়ের একটি 'সুপ্ত প্রসঙ্গ' বলা যায়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাস্তায় নেমে এসব বিক্ষোভ-আন্দোলনের সাথে বিগত চারদলীয় সরকারের কতিপয় ব্যক্তির যোগাযোগ ও চুক্তি ছিল।

---

৩০ 'বিগাট হ্যারাস আহমদিয়া ফ্যামিলি' *দি ডেইলি স্টার*, ২০ জানুয়ারি ২০০৮।

৩১ এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইন্দোনেশীয় সরকার আহমদিয়া সম্প্রদায়কে নিষিদ্ধ করেছে, বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যার প্রভাব পড়তে পারে।

৩২ 'কাদিয়ানিরা ফিৎনা তৈরি করছে, তাদের অমুসলিম ঘোষণা কর', *ইনকিলাব*, ১৩ জুলাই ২০০৮, আরো দেখুন : *যুগান্তর*, ২৪ জুন, ২০০৮।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আহমদিয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেও বিপরীতে আহমদিয়াবিরোধীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করছে। জরুরি অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও জঙ্গি চরমপন্থিরা কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানের ঘটনায় রাস্তায় উপর্যুপরি মারমুখী আচরণ করেছে, ভাস্কর্যের ওপর আক্রমণ করেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে দেয়নি ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে।

চাকরি, শিক্ষা ও ভোটাধিকার

২০০৬-এর মানবাধিকার প্রতিবেদনে[৩৩] যেমন বলা হয়েছে সরকারের সব বিভাগে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত এবং প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য বিভাগে বিষয়টা আরো পরিষ্কার। বিগত সংসদে ৩০০ সদস্যের ভেতর মাত্র আটজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি এবং এ বছর ঘোষিত প্রার্থী তালিকা থেকে এই প্রবণতার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। গণমাধ্যম ও এনজিও ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান হলেও মোটের ওপর সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তাদের উপস্থিতি সন্তোষজনক নয়। পর্যাপ্ত পরিসংখ্যানগত উপাত্তের অভাবের কারণে নিয়মতান্ত্রিক বঞ্চনার পুরো চিত্র হাজির করা কঠিন। সরকারি ও করপোরেট চাকরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্তরের ওপরে সংখ্যালঘুদের প্রমোশন না পাওয়ার 'অদৃশ্য দেয়াল' বিষয়েও কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না।[৩৪]

অনুবাদ : এস. এম. রেজাউল করিম

৩৩ দেখুন : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৬*, আসক ২০০৭, পৃ. ১৫৫।

৩৪ এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম ২০০৬-এ হিন্দু পুলিশ অফিসারদের প্রমোশন স্বল্পতা নিয়ে *দি ডেইলি স্টারের* একটি তদন্ত প্রতিবেদন।